পরিক্রমা

ভূরিদান

ফুল ফোটার দিন শুরু হয়েছে। প্রকৃতির অঙ্গন রঙিন ফুলে ফুলে ভরে উঠছে। অচেনা ফুল হয়ে ফুটেছিল এক আশ্চর্য সুরভিত স্বর্গকুসুম। সে-কুসুমের সুগন্ধে আমোদিত হয়েছিল দিগ্‌দিগন্তর—বিশ্বের অঙ্গনে বাহিত তার অম্লান সৌরভ। সে-ফুল ছিল কল্পতরুর শাখায়। সে যেন দৈবীলতা পাদপের শাখায় মুঞ্জরিত। মর্ত্যের মেলায় হাঁড়িভাঙার লীলায় সে-অদৃশ্য কুসুমিত কল্পতরু দৃশ্যমান হল। এমন ঈশ্বরচৈতন্যদায়ী কল্পতরু স্বর্গলোকেরও অগোচর। সেই দেবের দুর্লভ ঘটনার সাক্ষী কাশীপুরের উদ্যান। অবতার দেশ-কালে দিতে আসেন। এবার পরিধি-অতিক্রমী সেই মহাদান বিশ্বে ধীরে ধীরে প্রসারিত হচ্ছে।

দিয়েছেন তিনি অন্তরের ঐশ্বর্যের সন্ধান, ভিতরের দ্বার খোলার চাবিকাঠি। তিনি কাশীপুরের উদ্যানবাটীর অঙ্গনে বলেছিলেন—"কি আর বলব! তোমাদের চৈতন্য হোক।" ভক্তদের ছুঁয়ে একথা উচ্চারণমাত্র স্ফুরিত হল চৈতন্যের অনন্ত ফোয়ারা। যে-ভক্তেরা অভিষিক্ত হলেন তাঁরা সকলেই উন্মত্ত অমৃতের সেই ধারাপানে। পরবর্তী জীবন তাঁদের সোনা হয়ে গেল। সেই অনিঃশেষ চৈতন্যের ধারা আজও সমভাবে বর্ষিত হয়ে চলেছে অধ্যাত্মতৃষাতুর জীবনে। চাওয়ার মতন চাইলে তা পাওয়া যায়। যাঁরা না চাইতেই পেয়েছিলেন তাঁরা মহাভাগ্যবান। ভগবানের কৃপার অপূর্ব নিদর্শন। এই ঘটনা শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের শেষ অধ্যায়। সেখানে তিনি তৈরি করে দিলেন চেতনার আরোহিণী।

যুগে যুগে আবির্ভূত হন জগৎ আলোড়নকারী মহাশক্তি। বিশেষ করে ভারতের মাটি বারবারই তাঁদের পবিত্র পদচিহ্ন ধারণ করে ধন্য হয়েছে, পুণ্যভূ হয়েছে। এবারে রাজা তাঁর ঐশ্বর্য লুকিয়ে রাজ্য পরিদর্শন করতে এলেন। কোন অজ গ্রাম কামারপুকুর! সেখানে অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণ দম্পতি। গোপন আলোকসূত্রে খবর এল—তিনি আসছেন। গয়াধাম থেকে সেই নিগূঢ় বার্তা বুকে নিয়ে ক্ষুদিরাম ফিরলেন। নবদূর্বাদল শ্যামল পুরাণপুরুষের তাঁর গৃহে জন্ম নেওয়ার অমোঘ ইচ্ছাকে তিনি প্রতিহত করতে পারেননি। নিজের চরম দারিদ্র্যের কথা ভেবে আত্মহারা হয়েছেন। ঘরে ফিরে শুনলেন যুগীদের শিবমন্দিরে চন্দ্রা দেবীর অঙ্গে অলৌকিক জ্যোতি প্রবেশের কাহিনি। কার নির্ভুল পরিকল্পনায় সব হয়ে যাচ্ছে। নেমে আসছে ত্রিভুবনবিহারী এক দুর্দমনীয় মহাশক্তি প্রাকৃত শিশুর আকারে। পবিত্রতার পুঞ্জ, মেধায় উজ্জ্বল, অপরিসীম ইচ্ছাশক্তির আকর বালক তার মাধুর্যে, সরলতায়, রূপের ছটায় মানুষকে আকর্ষণ করছে। পল্লিবাসীর আদরের গদাই গরিবের কুঁড়েঘর আলো করে চন্দ্রার আঁচল ধরে নৃত্যগীত করছে। শিশুর দিব্যপরিচয় দেওয়ার আগেই লোকান্তরে চলে গেলেন ক্ষুদিরাম। চেনানো হল না সেই অচেনা শিশুদেবতাকে। চেনা-অচেনার পথ ধরেই বালক কৈশোর পার হয়ে যৌবনে পা দিলেন। টোলে পাণ্ডিত্যের পাঠ নিলেন না, শাস্ত্রের মধ্যে খুঁজলেন না সত্যকে। গ্রামের মানুষের মেলায় দুচোখ খোলা রেখে পদে পদে অন্তরঙ্গ সাথি, বহিরঙ্গের সঙ্গীদের বেছে নিলেন। বারো মাসে তেরো পার্বণের আনন্দোৎসবে যোগ দিয়ে পিতার বিয়োগব্যথা কিছুটা বিস্মৃত হলেন। মায়ের প্রতি তাঁর অখণ্ড মনোযোগ। মা যে বড় একা হয়ে গেছেন! সেই অমেয় সহানুভূতি জীবজগতের দুঃখের প্রতি

তাঁকে সচেতন করল। পল্লির মানুষ, তাদের জীবনযাত্রা হয়ে গেল তাঁর জীবনের চালচিত্র।

তাঁর বাল্যলীলার সাক্ষী ছিল কামারপুকুরের প্রকৃতি। উন্মুক্ত আদিগন্ত প্রান্তর, সোনালি ধানের ঢেউ তোলা খেত, সবুজ গাছের শোভা, ঊর্ধ্বে নীলাকাশের চন্দ্রাতপ। প্রথমে গ্রামের পাঠশালায় পাঠ নিলেন লৌকিক বিদ্যার, অন্তরঙ্গভাবে পাঠ নিলেন সাধুদের পান্থনিবাসে। সেখানে জল এনে, কাঠ এনে সেই শিশু ভগবান পরিচর্যা করতেন। কৈশোরেই দেখা গিয়েছিল বালকের তন্ময় ও ভাবস্থ হওয়ার প্রবণতা। আলের পথে টেকোয় মুড়ি নিয়ে যেতে যেতে দেখলেন কালো মেঘের মধ্যে ধবধবে সাদা বকের পাঁতি। সেই দৃশ্যে আত্মহারা গদাইয়ের হাত থেকে টেকো পড়ে গেল। চেতনা যুক্ত হল কোন অনন্তের অসীম সুরে। সামনে প্রসারিত ধূ ধূ মাঠ, গ্রামের ধূলিমাখা পথ ইঙ্গিত করত অনন্তের। কোন শশী-সূর্য-নক্ষত্রের পথে মিশে গিয়েছে সে-অসীম পথপ্রান্ত। পরে বলেছিলেন এক অপূর্ব চেতনায় বিলীন হওয়ার কথা। বিশালাক্ষীর পথেও আনন্দময় বালক চেতনা হারালেন। দেবীচেতনার সমুদ্রে মিশে গেল কিশোরের ভাবগঙ্গার প্রবাহ।

কলকাতা মহানগরী ছাড়িয়ে দক্ষিণেশ্বরে রানি রাসমণির কালীবাড়ির প্রাঙ্গণে যতিচিহ্ন পড়ল কালের। পঞ্চবটীর জড়পাদপের তলায় নবনব চেতনার উদ্ভব হল। দিবানিশি এক হয়ে সাধকের সাধনসরণি রচনা করল। ঈশ্বরদর্শনের ব্যাকুলতায় উন্মত্ত হয়ে একদিন মা ভবতারিণীর গর্ভমন্দিরে রাখা খড়্গ হাতে তুলে নিলেন। ঈশ্বরদর্শন হল অভিনব চেতনসমুদ্রে হাবুডুবু খেয়ে। পরে তাঁর এই চৈতন্যেরই বিলাস সপার্ষদ ভক্তবৃন্দকে নিয়ে। জগদম্বার চেতনসমুদ্রে অভিষিক্ত হয়ে তিনি বিচিত্র সাধনসাগরে ডুব দিলেন। সাধন শেষ হল অদ্বৈত-মহাসাগরে। ঈশামসি ও আল্লার দর্শন পেয়ে প্রত্যক্ষ করলেন বিশাল ধর্মজগতের অন্তহীন মহিমা—যত মত তত পথ।

সাধনার শেষে শান্ত সাধক—মনে ধারণ করেছেন বেদ-পুরাণ-দর্শন ছাড়িয়ে বিশাল জ্ঞানের ভাণ্ডার। তারপরই বিতরণের মহাকার্য সামনে। এ-সম্পদ কি জড়কে দেওয়ার? ঈশ্বরচেতনার স্ফুরণ না হলে কে গ্রহণ করতে পারে? চৈতন্যদানের উৎকৃষ্ট আধার খুঁজে বেড়াতেন তিনি। দেখলেন চারপাশে অধিকাংশই বিকারের রোগী। তারা এক জালা জল পান করতে চায়, হাঁড়ি হাঁড়ি অন্ন খেতে চায়। বৈদ্য অপেক্ষা করেন—রোগ ভাল হলে তবে তাদের চাওয়া যথার্থ হবে।

তিনি যে দিতেই এসেছেন! মন তাঁর সমাধি ছুঁয়ে থাকত, কখনও বা লীন হয়ে যেত। সমাধির চেতনায় তলিয়ে যাওয়া মনটিকে বহু কষ্টে তিনি জীবজগতের কল্যাণে নামিয়ে আনতেন মানুষের সঙ্গে দুটো কথা বলার জন্য। সামান্য আলাপেই পথ চিনিয়ে দিচ্ছেন, তাদের অজ্ঞাতসারেই আন্তর চেতনাকে ঊর্ধ্বমুখী করছেন। তাঁর দিব্য হাসি, আলাপচারিতা, নৃত্য-গীত সবের মধ্যেই বিকীর্ণ হচ্ছে মহাচৈতন্যের দ্যুতি। শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের অন্তঃলীলার শেষ অধ্যায়টিতে তাঁকে কল্পতরু বলেছেন ভক্তেরা। কল্পতরু তো নির্বিচারে সকলের প্রার্থনা পূর্ণ করেন। অবতার যখন কল্পতরু হন, তিনি জীবকে সেরা বস্তুটিই দান করেন। তাঁর কাছে এসেছে বিকারগ্রস্ত মানুষ। মনে কত কী আকাঙ্ক্ষা সুপ্ত রয়েছে। তাই ভবরোগবৈদ্য শ্রীরামকৃষ্ণ সকলের জন্যই নিদান দিলেন চৈতন্যের। যে-ব্রহ্মচৈতন্য তাঁর অবয়বে ঝরে পড়ত, সেই চৈতন্যের ধারায় অবগাহন করে মানুষ নিজের স্বাভাবিক শুদ্ধসত্তা ফিরে পাবে।

সাধারণ মানুষের উচ্চতর বিষয়ে মতি নেই। বহু বিষয়ী ব্যক্তি তখন পরমহংসদেবের নাম শুনে আসত। ঘরে অনেকসময় থাকতেন সম্পন্ন গৃহী

মানুষ। তাঁদের দেখে সকলেই ভিড় জমাত। ঘুরে ঘুরে আসত বিষয়প্রসঙ্গ, গৃহীদের নানান সমস্যার কথা। কারও চাকরি নেই, সেও এসে বসে থাকত। ভগবৎকথা শোনার লোক কই! অধ্যাত্মজগতের পূর্ণ অনুভূতি নিয়ে তিনি অপেক্ষমাণ। প্রাণের কথা তাই বলেছিলেন নরেন্দ্রকে—''বিষয়ী লোকের বাজে প্রসঙ্গ শুনিতে শুনিতে আমার কান ঝলসিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে, প্রাণের কথা কাহাকেও বলিতে না পাইয়া আমার পেট ফুলিয়া রহিয়াছে...।''

ক্রমে তাঁর চারপাশে সমবেত হলেন ভক্তেরা যাঁরা ভগবানকে পেতে চান। ঈশ্বরের দর্শন কেমন করে পাবেন সেই চিন্তায় তাঁরা বিভোর। এই ভক্তদের সঙ্গ তাঁর প্রিয় ছিল। তিনি সেইসব অধ্যাত্মজিজ্ঞাসুকে কী দিতেন? সাধুসন্তের দল একসময় অবিরাম তাঁর ঘরে এসেছেন, পরমহংসের সঙ্গ করতে। কী পেয়েছেন তাঁরা বলেননি, কিন্তু শূন্যহাতে কেউ ফেরেননি। ঈশ্বরজিজ্ঞাসু পণ্ডিতেরা এসে তাঁকে দেখে মুগ্ধ। দেখছেন এঁর উপলব্ধি বেদ-বেদান্ত ছাড়িয়ে যাচ্ছে। কতজন তাঁর পদযুগল ধারণ করে 'গুরো চৈতন্যং দেহি' বলে অশ্রুবিসর্জন করছেন। কেউ বা চেতনা হারিয়ে গভীরভাবে ধ্যানস্থ। মা ভবতারিণী কিন্তু অলক্ষ্যে ত্যাগীমণ্ডল রচনা করেছিলেন তাঁর ত্যাগীশ্বর সন্তানের জন্য। তিনি পেয়েছিলেন গুটিকতক দরদি অন্তরঙ্গ পার্ষদ। তাঁদের ঢেলে দিয়েছেন তাঁর ঐশ্বর্য। শ্রীম-র কাছে বলেছিলেন তাঁর গোপন ঐশী বৈভবের কথা—বিবেক, বৈরাগ্য, জ্ঞান, প্রেম, সমাধি। কিন্তু আলু-পটলের খদ্দের লক্ষ টাকার হীরে চিনতে পারে না। কামারপুকুরের অচেনা বৃক্ষটি সাধারণ বৃক্ষের মতোই দেখতে কিন্তু তাকে কোনও বিশেষ শ্রেণির মধ্যে কি আনা যায়? তাঁর মূর্তি যে মহাচৈতন্যের! বাইরের সাজগোজ, ঠাটবাট কিছুই নেই। আছে মিঠে কথা, ভুবনভোলানো মাধুর্যময় রূপ, কণ্ঠে মধুর সুরালাপ, কীর্তনে পায়ে পায়ে নৃত্যের ছন্দ, অবয়বের আন্দোলনে ছড়িয়ে পড়া মাধুর্য। জড়ত্ব সেখানে ঘেঁষতে পারে না। এমন দিব্যবিগ্রহের সঙ্গ করলেন যাঁরা তাঁরা আকণ্ঠ পান করলেন অমৃতধারা। তাঁরা সংসারের শিকল ভেঙে কেমন করে চলে এলেন সে-কাহিনি ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত হল। তাঁরাই বোধে বোধ করলেন—অবতারগণ সব যুগেই চেতনার জীবন্ত বিগ্রহ। তাঁরা জগতে বাস করলেও হুঁশ হারান না। জীবে জীবে চেতনা জাগাতেই তাঁদের আবির্ভাব। হয়তো তার পদ্ধতির মধ্যে বৈচিত্র্য। কিন্তু তাঁদের চলা, বলা, জীবনযাত্রা—সবকিছুর মধ্যেই বিরাট চেতনার প্রকাশ।

তাঁর সামান্য একটি স্পর্শে নরেন্দ্রের সামনে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সমেত তাঁর সত্তা লুপ্ত হতে চলেছিল। ভক্তদের জন্য এতটুকু ছোঁয়া রেখেছিলেন যা তারা সইতে পারে। এই যে চেতনার অমৃতবর্ষণ, তার কিছু ধরে রাখলেন শ্রীম তাঁর কথামৃতের কথায়। প্রথমে মনে হয়েছিল যেন পাঁচটি খণ্ডে কথাচিত্র ধরা আছে। কিন্তু আজ দেখছি সে-অমৃত পান করে অদ্ভুত চেতনার জাগরণ। ও এক জীবন্ত, জ্বলন্ত চেতনার আগুন। শুধু কাশীপুরেই নয়, কথামৃত আজ লক্ষ লক্ষ প্রাণে সঞ্চার করে দিচ্ছে অমৃতের চেতনা। সঙ্গে আছে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ'—ভাগবতের মতো। ভগবানের এমন দিব্যচিত্র রচনা প্রাণ আলোড়িত করে। বহুবার পড়তে পড়তে তবে মনের যোগ্যতা জাগে সেই প্রেমবিগ্রহকে অন্তরে ধারণ করার। লেখক আগুন জ্বেলে দিয়েছেন। গ্রন্থটি অসমাপ্ত। তবু সেখানেও ওই চেতনার আগুনের খেলা। আগুনকে ধারণ করতে কে পারে? ঠাকুরের জন্মযোগী সন্তানগণ সে-আগুন প্রাণে নিয়ে জীবন উৎসর্গ করেছেন। তাই ভাবি সকলের জন্য যে-আশীর্বাদ কাশীপুরে তিনি কবে শ্রীমুখে উচ্চারণ করেছিলেন—'তোমাদের চৈতন্য হোক'—সেই আশীর্বাদই অহরহ মনে রেখে তাঁকে যেন হৃদয়ে বসাতে পারি একান্ত আপন প্রিয়জনরূপে।